করমপরব। ছবি ঃ সংগ্রহ

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের আরণ্যক ও কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী লোকউৎসব করমপরব

রাজীব মাল

রূপসী বাংলার মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে অবস্থিতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম - এই জেলাগুলির সীমানাবর্তী অঞ্চল বর্তমানে ও জঙ্গলাকীর্ণ। রুক্ষ-শুষ্ক আবহাওয়ার মাঝেই শাল-পিয়াল-পলাশ-মহুয়া-সেগুনের বিস্তৃত শ্যামল বনরাজির প্রাণবন্ত স্নিগ্ধতা, রাঙা ফুলের গন্ধবাহার, রঙিন পাখিদের কলকাকলী, ছোট ছোট পাহাড় টিলার মায়াবী হাতছানি, কাঁসাই, কুমারী, শিলাই, আরুশা প্রভৃতি নদীর তরঙ্গায়িত রূপালি প্রবাহধারা, অবিরাম মুক্ত প্রান্তভূমির লাবণ্যময়তা এইসব নিয়েই জঙ্গলমহল মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এক স্বাতন্ত্র অঞ্চল। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি' পাহাড় অরণ্যের এই দেশে সবুজ তরুলতাবেষ্টিত মূলত আদিবাসী ও জনজাতি প্রধান-গ্রামগুলি তাদের নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যে এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্রতাকে আরও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তুলছে। জনজীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই অঞ্চলের বিভিন্ন লোকউৎসব, পূজা-পার্বণ, পরব, মেলা ইত্যাদি যেমন, লোকউৎসব (করম, জাওয়া, বাহা, টুসু, ভাদু, ইঁদ, ছাতাপরব ইত্যাদি) লোকসঙ্গীত (জাওয়া, টুসু, ভাদু, ঝুমুর, বাউল, কবিগান ইত্যাদি) এবং লোকনৃত্য (করম, দাসাই, ছৌ, কাঠি, বুলবুলি নাচ ইত্যাদি)

লোক সংস্কৃতির শিকড় রয়েছে রাঢ় বাংলার রাঙামাটিতে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অংশে রানীবাঁধ, খাতড়া, রায়পুর, তালডাংরা, হিড়বাঁধ ব্লকে এবং জেলার অন্যান্য কিছু অংশে যেখানে প্রধানত আদিবাসী ও জনজাতির মানুষের বসবাসের আধিক্য সেইসব অঞ্চলে করমপরব অত্যন্ত মর্যাদা ও সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। করম পরব আদিবাসী জাতির একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক উৎসব। পল্লবঘন, তরুবীথিবেষ্টিত ছায়াশীতল এই

অঞ্চলের গ্রামগুলিতে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিজ, কুর্মী, খেরিয়া, শবর, পাহান সহ প্রায় ৩৮জনজাতির বসবাসকারী মানুষ করম পরব পালন করে।

করম প্রধানত সৃষ্টির উৎসব। প্রচলিতভাবে যে কোন পূজা কোন দেবতার বিগ্রহকে ঘিরে অনুরণিত হলেও এই করমপূজার মূল অনুষঙ্গ আবর্তিত হয় শুধুমাত্র বৃক্ষকে ঘিরে। এই প্রকৃতিজ লৌকিক উৎসবের মূল অন্তর্নিহিত বিষয় হল প্রকৃতি বন্দনা তথা বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা ও শস্য উৎপাদন। জল, জঙ্গল ও জমির সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে আত্মিকবন্ধন। তাদের বিশ্বাস গাছের যে প্রাণ আছে, তা তাদের পূর্বপুরুষগণ অনেক আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। প্রাচীনকালে যখন কৃষিসভ্যতা বিকাশ লাভ করে, তখন চাষ বাসই ছিল মানুষের একমাত্র করম বা কর্মা। করম অর্থ কর্ম করা। কর্মই সমৃদ্ধির মূল। আদিবাসী ও জনজাতির মানুষেরা মনে করত করম পূজার মাধ্যমেই দেবতা সন্তুষ্ট হন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়, অতিবৃষ্টি প্রভৃতিতে ফসল রক্ষা করেন। অধিক ফসল কামনায় এই পূজার প্রচলন।

জঙ্গলমহলে করম পরবে বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে প্রকৃতি পূজা। কৃষি ও নারী এই উৎসবে সমার্থক। মানব ও প্রকৃতির আত্মিকযোগ। তাই প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনে দুই মায়ের স্থান সর্বোচ্চ। প্রথমত প্রকৃতিমাতা এবং দ্বিতীয়ত জন্মদাত্রী মাতা। কৃষিভিত্তিক ভারতীয় সভ্যতা প্রজনন ক্ষমতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতিজ ও লোকজ উপাদানের গর্ভ থেকে জাত এখানের প্রাচীন লোকসংস্কৃতি।

দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগঞ্জে অম্বুবাচী তিথি সমাপ্ত হলে চাষবাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। শ্রাবণ মাসের থেকে ভাদ্র মাসের প্রথম পর্যন্ত বীজতলা তৈরী ও ধান্য রোপন শেষ হয়। তাই বীজবপনের উৎসব হল করম। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিনে করম পূজা পালিত হয়। এই দিনকে পার্শ্ব একাদশী বলে। এই বিশেষ দিনে নররূপী নারায়ণ দেবতা অনন্ত শয্যায় পাশ ফিরে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন। ধরিত্রীর যে দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল, সেই অংশ শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছিল। এই তিথিতেই করম গাছের ডালকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে আদিবাসী ও জনজাতির মানুষজন।

পার্শ্ব একাদশীর সাত দিন আগে থেকে করম পূজার আচার অনুষ্ঠান শুরু হয় করমনাচ ও জাওয়া গানের মহড়ার মাধ্যমে। এই পরবের অন্যতম চিত্তাকর্ষক অঙ্গ নাচ ও গান। পার্শ্ব একাদশীর সাতদিন আগে গ্রামের কুমারী মেয়েরা শালের দাঁতনকাঠি ভোরবেলায় জঙ্গল থেকে ভেঙে নিয়ে আসে। তারপর শুদ্ধাচারের সঙ্গে নিকটবর্তী নদী বা পুকুরে স্নান করে। স্নানের পর কুমারী মেয়েরা নিজ নিজ বাঁশের ডালায় বা টোপায় নদী বা পুকুরের বালি ভরে নিয়ে আসে। গ্রামের মাথায় এসে সেই বালি ভর্তি ডালাগুলিকে এক স্থানে রেখে জাওয়া গান গাইতে গাইতে তিন পাক ঘুরে। এই সময় যে রকম জাওয়া গান গাওয়া হয় তা আচার মূলক। যেমন -

"আইসঅ লো সঙ্গতি সবাই হাত ধইরে নাচি লো
একমনে জাওয়া দিব, জাওয়া যেন বাড়হে লো।।
কাঁসাই লদির বালি আইনে জাওয়া পাতাব লো।
হামদের জাওয়া উঠে শাল ধুঁধের পারা লো।।"

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, জাওয়া গান করম পূজার গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। এই জাওয়া গানগুলির কোনো লিখিত রূপ পাওয়া না গেলেও প্রতি গ্রামে বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত। করম নাচ ও জাওয়াগানগুলো করার সময় ঢোল, ধামসা, মাদল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সুরমূর্চ্ছনায় অভিনব ভাব গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মেয়েদের কাব্য প্রতিভা, সুরসৃষ্টি ও ছান্দিক পদচালনায় এই নাচ ও গান দৃষ্টিনন্দন ও শ্রুতিসুখকর হয়। এই গানগুলি তাৎক্ষনিকভাবে কণ্ঠ থেকেও উৎসারিত হয়। এই গানগুলি মাধ্যমে গ্রাম্য জীবনের আশা-আকাঙ্খা, নারী সমাজের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-ভালোবাসার সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশিত হয়। এগুলি তাদের জীবনের হৃদয়ের ও আদরের গান। এই জাওয়া গানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মূলত ছয় প্রকারের গান - ১) আচারমূলক ২) ডহইরা, ৩) আখরা বন্দনা ৪) চাষবাস সম্পর্কিত ৫) নারীকেন্দ্রিক ৬) ভাসান।

তারপর কুমারী মেয়েরা ডালাগুলিকে ঘরে এনে সেই বালিতে ভুট্টা, অড়হর, মুগ, বুট, রমা, কুক্ষি ইত্যাদি বীজ পুঁতে দেয়। একে জাওয়া পাতা বলে। এই জাওয়াপাতার মধ্যে সৃজনশীলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জন্ম > জাত > জাওয়া - এইভাবে শব্দটির উৎপত্তি। কুড়মালি ভাষায় এর অর্থ 'অঙ্কুরোদগম'। কর্মের দ্বারা জাত ফসলের জিয়ানোর নাম হল জাওয়া পাতা। যে ডালাতে জাওয়া পাতা হয়, সেটিকে বলে জাওয়া ডালা। প্রত্যহ সকালে ডালায় হলুদ গোলা জল দেওয়া হয়। যে দিন থেকে জাওয়া পাতা হয়, সেই দিন থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঘরের আঙিনায় বা গ্রামের মোড়ে কুমারী মেয়েরা ডালাগুলিকে রেখে পরস্পর হাত ধরাধরি করে ঘড়ি কাঁটার বিপরীতে চক্রাকারে নাচ ও গান করে। তখন এই গানকে ডহইরা জাতীয় জাওয়া গান বলে। ডহর শব্দের অর্থ রাস্তা। ডহর থেকে ডহইরা। ডালা নিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে এই গান করা হয় বলে ডহইরা জাওয়া গান বলে। যেমন -

১। বনে ফুটিল ফুল গাঁকে আল বাস লো।
পথ চলিতে মন হল উদাস গো।।
২। চলরে সঙ্গতি সবাই জাওয়া বেড়াতে লো।
বেলা হল্য জইড় (অশ্বত্থ) গাছের আড়ে।।
৩। বাড়ি নামায় বুনলাম সরিষা।
পাতে বুলুর ফুলে বহুলা।।

তারপর ডালাগুলিতে পোঁতা বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হয়ে চারা বের হতে থাকে. পার্শ্ব একাদশীর আগের দিন গ্রামের যুবক যুবতীরা নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে করম গাছের দুটি ডাল কেটে এনে গ্রামেরই কোনো পুকুরে পুঁতে রাখে। একাদশীর দিন গ্রামের বয়স্ক মানুষদের নির্দিষ্ট করা স্থানে ঐ করম ডাল দুটি পোঁতা হয়। এই ডাল দুটির একটি করম ও অন্যটি ধরম হিসেবে কল্পিত হয়। প্রধানত করম পূজা কুমারী মেয়েদের ব্রত পূজা। বৃক্ষ ও নারীকে সম্মান করতেই এই পূজা। গ্রামের ব্রতচারিনী কুমারী মেয়েরা সারাদিন উপবাস থেকে ভাদ্র একাদশীর সন্ধ্যার পর থালায় ফুল, ফল, ঘি, গুড়, আতপচাল, একগাছি ধানচারা ইত্যাদি পূজার নৈবদ্য সাজিয়ে জাওয়া ডালা সহ করম তলায় (যেখানে করম ডাল দুটি পোঁতা হয়েছে) উপস্থিত হয়। থালায় অবশ্যই একটি শসা বা কাঁকুড় থাকবেই। এই পূজার পূজারীকে লায়া বলে। পূজারী ওখানে বিভিন্ন প্রকার আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজা শুরু করে। ঐ ব্রতচারিণী মেয়েরা পূজায় অংশগ্রহণ করে এবং করম ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে

ছবি ঃ সংগ্রহ

যোগ্য সুস্বামী পাওয়ার এবং সন্তানবতী হওয়ার। কুমারী মেয়েরা ঐ শসা বা কাঁকুড়টিকে ব্যাটা (পুত্র) হিসেবে কল্পনা করে। জাওয়া ডালাতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের মতো কুমারী মেয়েরা একদিন প্রজননশীলা হয়ে মাতৃত্বলাভ করবে। এই পূজার মাধ্যমে কুমারী মেয়েদের মাতৃরূপে ভবিষ্যৎ সুখী পরিবার ও সমাজ গঠনের বার্তা দেওয়া হয়। গ্রামের যে স্থানে বা আখরায় করমপূজা হয়, সেই স্থানে আলপনা দেওয়ার রীতি। করম ডালদুটিকে একটি পুরুষ বা সূর্যদেব এবং অন্যটি প্রকৃতি বা ধারিত্রী মাতার প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়। অত্যন্ত সহজ সরল এই পূজার আসল চরিত্র হচ্ছে নিষ্ঠা ও ভক্তি। ধরিত্রীমাতা ফুলে ফলে ফসলে ভরে উঠুক, গৃহস্থ পরিবারে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বিরাজ করুক এটিই পূজার মূল প্রার্থনা। ভাই বোনের পবিত্র সম্পর্ক নিয়েও গান করা এই পূজার অন্যতম অঙ্গ। এই পূজায় কোনো পুঁথির মন্ত্র নয়, হৃদয় থেকে উৎসারিত কথার মাধ্যমে প্রকৃতি বন্দনা করা হয়। প্রকৃতি বন্দনা, পৃথিবী বন্দনা ও সর্বোপরি কুমারী শক্তির বন্দনা দিয়ে শেষ হয় মূল পূজার আচার অনুষ্ঠান। পূজা চলাকালীন ব্রতচারিণীরা 'জাওয়া' গান গায়, তখন কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। এগুলি আখরা বন্দনার গান বলে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত -

প্রথমে বন্দনা করি গাঁয়েরি গরাম হরি।
তারপরে বন্দনা করি করম ঠাকুর।।
ঘিয়ে দুধে বন্দিব গাঁয়েরি গরাম হরি।
জাওয়া দিয়ে বন্দিব করম ঠাকুর।।

মূল করম পূজা সমাপ্ত হওয়ার পর কথকঠাকুর উপস্থিত সকলকে করম ঠাকুরের লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করেন। এটাই রীতি। কাহিনীটি হল -

করম ও ধরম দুই ভাই এক গ্রামে বাস করত। করম মাঠে গরু চরায় এবং ধরম চাষবাস করে। করমের একটি গরু হারিয়ে যায় একদিন। কাঁদতে কাঁদতে করম বন থেকে একটি করম ডাল কেটে এনে মাটিতে পুঁতে পূজা করে এবং ফল স্বরূপ গরুটি খুঁজে পায়। একদিন ধরম ডালটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় এবং করমকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন করম নদীর তীরে কুটির নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকে। নদী তীরবর্তী জঙ্গল লাগোয়া জমিতে ও নদীতীরে করম চাষবাস করতে থাকে। দিনে দিনে করমের ধনবৃদ্ধি হতে থাকে। অন্যদিকে ধরমের অবস্থা ভালো নয়। সে এক গুণিনের নিকট গিয়ে তার এই দূরাবস্থার কথা জানায় এবং ঐ ডাল জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কারণেই ধরমের দূরাবস্থা বলে জানতে পারে। ধরম নিজ ভুল উপলবব্ধি করে ভাই করমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। তখন আবার দুই ভাই মিলে করম ডাল পুঁতে ধুমধাম করে পূজা অর্চনা করল এবং তারা দুজনে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে সুখে দিন যাপন করতে লাগল। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এইভাবেই করম পূজার শুভ সূচনা হয়।

মূল পূজা অনুষ্ঠান শেষে কথকঠাকুর করম পূজার কাহিনী বর্ণনার পর সারারাত্রি ব্যাপী গ্রামের যুবকযুবতীরা করম দেবতার চারিধারে হাত ধরাধরি করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে নিজস্ব ভঙ্গিমায় নাচ ও গান করে। এই করম নাচ দ্রুত ও শ্লথ উভয় গতির হতে পারে। সঙ্গে জাওয়া গান করে। এই জাওয়া গান প্রধানত ভাদরিয়া ঝুমুর। উচ্চগ্রামে গান শুরু হয় এবং তার সুর ক্রমশ ধীর গতিতে নেমে আসে। রাত্রিতে আদিবাসী ও জনজাতির নাচ, গান, ধামসা মাদলের দ্রিম দ্রিম বোলের সুর মূর্চ্ছনায় বাঁধ ভাঙা আনন্দস্রোতে ভেসে যায় সমগ্র জঙ্গল মহল। এই সময় যে সব গান হয় তার কয়েকটি -

চাষবাস কেন্দ্রিক জাওয়া গান -

১। আমরা সবাই চাষার বিটি, তাই করেছি চাষ লো।
ডালায় টেকায় দিঁয়েছি চারা।
উপর খেতে হাল দাদা নামর খেতে কামিন রে।
কন খেতে লাগাবি দাদা কাজল কাঠি ধান রে।।
কাজল কাঠি ধান দাদা আগে আগে কাটিরে।
না পাইয়া লব দাদা দশ আড়া ধান রে।।
২। ভাদর মাসে জুনহার (ভুট্টা) লাল টুপাই খাবো গো।
আর কি মাঞ তার ঘরে বিটি জনম পাবো গো।।

নারী কেন্দ্রিক জাওয়া গানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

১। বাপের ঘরে দিল শাড়ি ধারে ধাইধকা ফুল লো।
শ্বশুর ঘরে বলে বহুর গেল জাতি কুল লো।।

২। মাছে ঝিঙায় রাঁধেছিলি ননদীর লাগ্যে লো
হেন বেলা খবর আলো ননদী মরেছে লো।
ননদী মরল্য ভালই হল্য কি বল্যে কাঁদিব লো।
ঝুমকাঝুরি কাজলের লতা লো।।

ভাদ্র একাদশীর রাত্রিতে সারা রাত্রি ব্যাপী নাচ ও গানের পর দ্বাদশীর দিন ব্রতচারিনী কুমারী মেয়েরা সকালবেলায় জাওয়া ডালা থেকে অঙ্কুরিত বীজগুলি ক্ষেতে খামারে ছড়িয়ে দেয়। দুপুর বেলায় ঐ জাওয়া ডালাগুলিকে এবং নৈবেদ্যের সেই শস্য বা কাঁকুড়টিকে নিকটবর্তী জলাশয়ে ভাসিয়ে দেয়। তারপর সেখানে তারা স্নান করে পরস্পরকে করম ডোর বা রাখি পরিয়ে দেয়। বাড়ী ফিরে এসে তারা উপবাস ভঙ্গ করে। এই পর্বে তারা ভাসান জাওয়া গান করে। যেমন -

১। মাছে যাছে করম ঠাকুর যাছে লো ছাঁইড়ে।
ঝিঙা পড়াআ বাসি ভাত যাছে লো খাঁইয়ে।।
২। আজকে করম ঠাকুর ঘর দুয়ারে।
কালকে করম ঠাকুর কাঁশ লদির পারে।।

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল তথা সমগ্র রাঢ়বঙ্গে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে ঝাড়খন্ড বিহার, উড়িষ্যায় (প্রধানত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে) অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে লোক উৎসব করম পরব পালিত হয়। এই করম পরব আদিবাসী ও মূলবাসীদের কাছে প্রকৃতির উপাসনা ও নবজীবনের আরাধনা। এই প্রকৃতিজ উৎসবের ভাবনায় নিহিত আছে মাটির উর্বরতা, শস্য সমৃদ্ধি এবং বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের তত্ত্বের প্রজনন শক্তির আরাধনা। সেই কারণে কুমারী মেয়েরা ব্রত পালনের মাধ্যমে পূজায় অংশগ্রহণ করে। আদিবাসী ও জনজাতির মানুষের মধ্যে বৃক্ষচেতনা ছিল, নিঃসন্দেহে তা অনুভব করা যায়। বৃক্ষকে ঘিরে মানবিক চেতনার চিরন্তন উৎসব হল এই করম পরব।

করম উৎসবে সমগ্র গ্রামের মানুষ সোৎসাহে মেতে ওঠে। সাম্যবাদী সমাজের যুথবদ্ধতা নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। তবে জাওয়াগানগুলি বাংলা লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ-একথা অনস্বীকার্য। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে বদলেছে মানুষের বিনোদনের ধরণ। সমগ্র বিশ্ব যখন আধুনিকতার আলোকে স্নাত, বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন - টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট, মুঠোফোন ইত্যাদি নিয়ে মাতোয়ারা এবং সমগ্র বিশ্বকে মানুষ হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে, ঠিক তখন জঙ্গলমহলের মানুষ বৃক্ষ ও শস্যকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি বন্দনা করছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও রাঢ়বঙ্গের জঙ্গহমহলের অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।।

গ্রন্থসূত্র ঃ ১। সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি - দিলীপ কুমার গোস্বামী, ২। বাংলায় লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব - বিনয় ঘোষ, ৩। মানভূমের লোকনৃত্য - সম্পাদনা সুভাষ রায় (রাঢ় প্রকাশন), ৪। জঙ্গলমহলের জীবন ও লোকসংস্কৃতি - সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক - শিক্ষক ও গবেষক।